



**Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)**

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 321 - 327

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: [editor@tirj.org.in](mailto:editor@tirj.org.in)

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

## লিঙ্গবৈষম্য বিরোধী স্বরের প্রতিষ্ঠায় একুশের তিন উপন্যাস

ড. ইন্দ্রানী হাজরা

সহকারী অধ্যাপক

কবি জগদ্রাম রায় গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ, মেজিয়া, বাঁকুড়া

Email ID: [indranihazra86@gmail.com](mailto:indranihazra86@gmail.com)

 0009-0007-3334-5856

**Received Date 20. 01. 2026**

**Selection Date 10. 02. 2026**

### Keyword

Gender  
Discrimination,  
Consciousness,  
Twenty-First  
Century,  
Bengali Novel.

### Abstract

In her famous work *The Second Sex* (1949), renowned feminist philosopher Simone de Beauvoir demonstrated that in a patriarchal society, men are considered the 'First Sex', while women are relegated to the status of the 'Second Sex'. Consequently, women bear the identity of second-class citizens within society. Society imposes artificial constructs and divisions of gender upon women. Femininity is constructed using features opposite to whatever society considers symbolic of masculinity. This construction brings inequality and deprivation to women.

Literature serves as one of the primary mediums for fostering human sensitivity and plays a vital role in eliminating various forms of discrimination from society. In Bengali fiction, authors have frequently taken up their pens against numerous societal inequalities. Many short stories and novels have been written in the Bengali language addressing gender discrimination; the list of such narratives is extensive.

For this discussion, we have selected three novels from the twenty-first century: Suchitra Bhattacharya's *Uro Megh* (2002), Tilottama Majumdar's *Ajo Kanya* (2010), and Sayantani Putatunda's *Nandini* (2013). This essay will explore how the discourse against gender discrimination manifests within these three novels.

Several educated, modern, working women are represented in these texts. Yet, even in the apparently progressive society of the twenty-first century, they face numerous deprivations simply because they are women. awful crimes such as female feticide, dowry-related torture, molestation, and rape remain all too common. Through these narratives, the authors portray the inhumane suffering women experience as a result.

However, these are not merely stories of oppression; the female authors also document the rebellion of individualistic female characters. In this rebellion against patriarchy, they are often supported by empathetic men. Thus, the novels raise a consciousness against gender discrimination within the readers of the twenty-first century.

## Discussion

লিঙ্গবৈষম্য বলতে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের দ্বারা লিঙ্গের ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মৌলিক মানবিক অধিকার অর্থাৎ সমানাধিকারকে অস্বীকার বা দমন করাকে বোঝানো হয়ে থাকে। পুরুষ শাসিত সামাজিক প্রতিষ্ঠানে শুরু থেকেই পুরুষতন্ত্রের দ্বারা লিঙ্গবৈষম্যের শিকার নারী। লিঙ্গগতভাবে নারী পুরুষ অপেক্ষা দুর্বল ও নিম্নমানের –এই ভাবনা থেকেই সমাজে লিঙ্গবৈষম্যের ধারণা উদ্ভূত হয়। বিখ্যাত নারীবাদী দার্শনিক সিমোন দ্য বোভেয়ার তাঁর ‘দ্য সেকেন্ড সেক্স’ (১৯৪৯) গ্রন্থে দেখান, এই সমাজে ক্ষমতায়নের মাপকাঠিতে পুরুষ প্রথম লিঙ্গ তথা প্রথম শ্রেণি এবং তুলনায় পিছিয়ে থাকা নারীরা দ্বিতীয় লিঙ্গ তথা দ্বিতীয় শ্রেণি হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। ‘নারী’ ধারণাটি একটি সামাজিক নির্মাণ, যা পুরুষের সাপেক্ষে ‘অন্য’ (The Other) হিসেবে সংজ্ঞায়িত। তাঁর মতে, নারী হয়ে কেউ জন্মায় না, কেউ কেউ নারী হয়ে ওঠে। ‘স্ট্রীলিঙ্গ নির্মাণ’ গ্রন্থে মল্লিকা সেনগুপ্ত বলেন, -

“লিঙ্গের কৃত্রিম ধারণা ও বিভাজন আরোপ করে সমাজ।”<sup>১</sup>

যা কিছু পৌরুষের প্রতীক বলে সমাজ মনে করে, তার বিপরীত লক্ষণগুলি দিয়ে নারীত্ব নির্মিত হয়, যা আসলে নারীর জন্য বয়ে আনে অসাম্য ও বঞ্চনা।

বিশ্বের ইতিহাসে দেখা যায়, পারিবারিক-সামাজিক ও রাষ্ট্রিক পরিকাঠামোয় আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সমানাধিকারের দাবিতে পুরুষ আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে নারীরা সংঘবদ্ধ হয়েছে, আন্দোলনে নেমেছে। নারীর জন্য লিঙ্গ-বৈষম্যহীন সমাজের প্রত্যাশায় গড়ে উঠেছে স্বতন্ত্র তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ – নারীবাদ। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণের ভাবধারা বিবর্তিত হলেও নারীর জন্য সমান মর্যাদা ও সুযোগের প্রতিষ্ঠাই তার মূল ভিত্তি। লিঙ্গবৈষম্য আসলে সমাজের অন্যান্য বৈষম্যের থেকে কিছুটা আলাদা। উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের মতো প্রান্তিক শ্রেণির মধ্যেও লিঙ্গবৈষম্য বিদ্যমান। তাছাড়া প্রান্তিক নারীরা অন্যান্য বৈষম্যেরও শিকার। ফলে এইসব ক্ষেত্রে নানা বিষয়ের সঙ্গে জড়িত হয়ে লিঙ্গ সমস্যা এক বহুমাত্রিক জটিল রূপ নেয়।<sup>২</sup>

মানুষের প্রতি সংবেদনশীলতা তৈরির মাধ্যমে সমাজে যে-কোনো প্রকার বৈষম্য দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে সাহিত্য। স্থান ও কাল ভেদে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় পারিপার্শ্বিক সমাজ প্রতিফলিত হয়। একথা বললে অত্যুক্তি হয় না যে, উনিশ শতক থেকে বিশ শতক হয়ে একুশ শতক পর্যন্ত সুদীর্ঘ সময় প্রবাহে নারী-পুরুষের সামাজিক অবস্থান ও ভূমিকা যেভাবে বিবর্তিত হয়েছে, তার প্রতিচ্ছবি লিপিবদ্ধ হয়েছে সমসাময়িক গল্প-উপন্যাসগুলিতে। সময়ের ধারাবাহিকতায় লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছে। সমাজের বিবিধ বৈষম্যের মতো নারীর প্রতি ঘটে চলা বৈষম্যগুলি ক্রমশ চিহ্নিত হয়েছে। নারীর কলমে, গল্প-উপন্যাস-কবিতা-আত্মজীবনীতে বিশেষভাবে ভাষারূপ পেয়েছে নারীর নিজস্ব জীবন-যন্ত্রণা। ধীরে ধীরে পুরুষ-নারী নির্বিশেষে, নিরপেক্ষ দৃষ্টির দৃষ্টিকোণে রচয়িতাদের কলমে নির্মিত হয়েছে অসংখ্য কাহিনি, যেখানে লিঙ্গ-বৈষম্যের ভয়াবহ দিকটি তুলে ধরে তার থেকে মুক্তির পথ অনুসন্ধান করেছেন লেখকেরা। বাংলা কথাসাহিত্যে এই বিষয়ে রচিত কাহিনির তালিকা দীর্ঘ। আমরা একুশ শতকের তিনটি উপন্যাসকে এই আলোচনায় বেছে নিয়েছি। উপন্যাসগুলি হল - সুচিত্রা ভট্টাচার্যের ‘উড়ো মেঘ’ (২০০২), তিলোত্তমা মজুমদারের ‘আজও কন্যা’ (২০১০) এবং সায়াস্তনী পূততুল্লের ‘নন্দিনী’ (২০১৩)। এই উপন্যাস তিনটিকে কেন্দ্র করে কীভাবে লেখকেরা সেখানে লিঙ্গ-বৈষম্য বিরোধী স্বরের প্রতিষ্ঠা দিতে প্রয়াসী হয়েছেন, তাই বর্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করব।

আলোচ্য কাহিনিগুলির নির্মাতারা তিনজনেই নারী। বিশ ও একুশ শতকে যেসব নারী সাহিত্যিকের লেখায় নারীর জীবন সুগভীর উপলব্ধিসহ বর্ণিত হয়েছে তাঁদের মধ্যে সুচিত্রা ভট্টাচার্য বা তিলোত্তমা মজুমদার অন্যতম। সায়াস্তনী পূততুল্ল একুশের আর একজন প্রতিষ্ঠিত লেখক। একুশ শতকে প্রকাশিত এই তিন কাহিনিতে মূলত বিশ শতকের শেষ ও একুশ শতকের প্রথম দশক প্রেক্ষাপট হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। যে নারীচরিত্রগুলি অবলম্বনে কাহিনিগুলি রচিত হয়েছে, তারা প্রত্যেকেই এই সময়পর্বের বিভিন্ন বয়সের নারী। তবে তাদের মধ্যে বেশিরভাগ শিক্ষিত কর্মরত আধুনিক যুবতী। আমাদের চারপাশে আপাতভাবে এগিয়ে থাকা সাম্যের যুগে একজন শিক্ষিত স্বনির্ভর নারীকে কীভাবে বৈষম্যের শিকার হতে হয়, তার ছোটো-বড়ো নানা দৃষ্টান্ত লেখকেরা এই কাহিনিগুলিতে তুলে ধরেছেন।

মনুসংহিতায় উল্লেখ আছে নারী শৈশবে পিতা, যৌবনে স্বামী আর বার্ধক্যে পুত্রের অধীন। সুকুমারী ভট্টাচার্যের লেখায় পাই –

“পরবর্তী সাহিত্য যে নারীকে ভোগ্যবস্তু ও পণ্যদ্রব্য বলতে সাহস করেছে তার জোরটা জুগিয়েছে বৈদিক সাহিত্যই। ক্রমেই অবশ্য ঐ ভোগ্যত্ব ও পণ্যত্বেই জোর দেওয়া বেড়েছে।”<sup>৩</sup>

পিতৃতান্ত্রিক অনুশাসন নির্দিষ্ট গণ্ডি অতিক্রম করা নারীর কি আজ প্রকৃত অর্থেই স্বাধীন? বহির্জগতে সকল ক্ষেত্রে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া নারী কি আজকের দিনে সত্যিই সুরক্ষিত? নৈমিত্তিক সংবাদপত্রগুলি কিন্তু আমাদের সেকথা বলে না। ঘরে-বাইরে স্ত্রীলতাহানি, কন্যাজঘনহত্যা, ধর্ষণ নারীর জীবনকে যে আজও ভয়াবহ করে রেখেছে, সে সত্য আমাদের সবার জানা। বহু বছর আগে শিক্ষার স্পর্শ বঞ্চিত, সংসারের ঘানিতে জীবন উৎসর্গীকৃত পরাধীন নারীর সঙ্গে বর্তমান সমাজের উচ্চশিক্ষিত স্বাধীন-স্বাবলম্বী নারীর অসহায়তা ও বিপন্নতা কোথাও যেন মিলেমিশে আজও এক হয়ে যায়। সভ্যতার অগ্রগতির বিপ্রতীপে নারীর জীবনের এই অন্ধকার দিকগুলি মনকে সংশয়ান্বিত করে। উপন্যাসগুলি পাঠকের মনে সেই সংশয়ের জায়গাটিতেই অভিঘাত সৃষ্টি করে। প্রাচুর্য সমাজে সমান্তরাল ভাবে প্রবাহিত এই জটিল সমস্যাটি সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করে পাঠককে।

সায়ন্তনী পুততুণ্ডের ‘নন্দিনী’ উপন্যাসে দেখা যায়, শিক্ষিত আধুনিক পরিবারের গৃহবধু স্নিগ্ধার গর্ভে আসা কন্যাজঘনটিকে হত্যা করতে বন্ধপরিবার স্বামী ও তার পরিবার। দিনরাত্রি নানাবিধ ষড়যন্ত্র চলে তার বিরুদ্ধে। গর্ভের সন্তান মৃত বলে তাকে গর্ভপাতে রাজি করানো, বাথরুমের মেঝে পিচ্ছিল করে রাখা, অনাহারে রাখা, দুধের মধ্যে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে তাকে অজ্ঞান করে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা - ইত্যাদি অত্যাচারের বিরুদ্ধে অনাগত সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আপ্রাণ লড়াই করতে হয় স্নিগ্ধাকে। আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ হওয়া সত্ত্বেও কেমনভাবে ডাক্তারকে অর্ধের লোভে বশীভূত করে জ্ঞানের লিঙ্গ নির্ণয় করানো হয় ও মায়ের ইচ্ছের বিরুদ্ধে গর্ভপাতের আয়োজনে মেতে ওঠে মেয়েটির স্বামী ও তার পরিবার, তা এখানে দেখানো হয়েছে। দৈনন্দিন জীবনে আমাদের চারপাশে ঘটে চলা ঘৃণ্য অপরাধকেই কাহিনীর আকারে তুলে ধরা হয়েছে এখানে। খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক বাণী বসুর ‘অমৃত’ উপন্যাসেও এই ধরনের সমস্যার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।

“অমানবিক, প্রকৃতিবিরুদ্ধ এই ক্রিয়াকলাপগুলি অনিবার্যভাবে লিঙ্গবৈষম্যেরও কারণ ঘটায়।”<sup>৪</sup>

১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে পণপ্রথা বিরোধী আইন তৈরি হলেও সমাজের প্রচলিত বিবাহ ব্যবস্থায় সেই আইনের ছাপ যে তেমন পড়েনি তা জানা কথা। উপহারের মোড়কে বিবাহে পণের আদান-প্রদান সমাজে আজও প্রচলিত। আর তাকে অস্বীকার করতে গেলে অনেকাংশে বিপত্তির সম্ভাবনা। ‘নন্দিনী’ উপন্যাসে স্নিগ্ধার সাংবাদিক বন্ধু আলো তার তিন বছরের প্রেমিকের কাছ থেকে গহনা-ফার্নিচারের জোরালো আবেদনে অসম্মানিত হয়ে বিয়ে ভেঙে দিলেও প্রেমিকের দুর্ব্যবহারে উত্বেজিত হয়ে থানায় রিপোর্ট করে। আর তার শাস্তি স্বরূপ বর্ষার রাতে অফিস থেকে ফেরার পথে প্রেমিক ও তার সঙ্গীদের হাতে নৃশংসভাবে গণধর্ষণের শিকার হয়। এইভাবে মনুষ্যত্বের মাপকাঠিতে প্রেমিকার কাছে পরাজিত হয়ে রাতের অন্ধকারে একাকিত্বের সুযোগ নিয়ে পাশবিকভাবে তাকে দমন করার প্রয়াস চালায় প্রেমিক পুরুষ।

তিলোত্তমা মজুমদারের ‘আজও কন্যা’ উপন্যাসে অজন্তার দশ বছরের পুরনো প্রেমিক তপোব্রতের মনেও যে পিতৃহীন অজন্তার সংসার প্রতিপালন, আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য কঠিন সংগ্রাম ভিন্ন সংজ্ঞায় মূল্যায়িত হয়, তা দেখান লেখক। মা-ভাইয়ের সংসারিক প্রয়োজন মেটাতে দায়বদ্ধ অজন্তার কাছ থেকে বিয়েতে কানাকড়ি লাভের আশাও নেই বুঝে সোচ্চারে ক্ষোভ প্রকাশে লজ্জিত হয় না সে। দীর্ঘদিনের ভালোবাসার অঙ্গীকারের মধ্যেও চাপা থাকে না পুরুষের যৌতুকের আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষার কাছে অপর দিকের মানুষটির অবমাননা তুচ্ছ হয়ে যায়। সেই অপমানে সম্পর্ক ভেঙে গেলে তখনও আহত হয় পৌরুষের অহমিকা। সাজা দেওয়ার জন্য কেউ বেছে নেয় ধর্ষণ ও খুনের পথ, কেউ নোংরাভাবে কালি লাগাতে চায় মেয়েটির চরিত্রে। তাই অজন্তার প্রাক্তন প্রেমিক তপোব্রত শিবেন্দু ও অজন্তার বিয়ের খবর শুনে অজন্তার সঙ্গে তার পূর্ব ঘনিষ্ঠতার খবর গোপনে শিবেন্দুর কাছে জানিয়ে তার চারিত্রিক শুদ্ধতা সম্পর্কে সংশয় জাগিয়ে দিতে চায়।

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের ‘উড়ো মেঘ’ উপন্যাসে অসহায় বিধবা কাননের মেয়ে শিউলি প্রতারক প্রেমিককে বিশ্বাস করে মুস্বাই-এর গণিকাপল্লিতে বিক্রি হয়ে যায়, সেখান থেকে ফিরে আসার পরেও সেই বিভীষিকাময় গণধর্ষণের স্মৃতি তাকে শয়নে-জাগরণে অহরহ পীড়িত করে। তার অত্যাচারিত জীবনের কথা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলে তাদের জীবনে বিড়ম্বনা আরও বৃদ্ধি পায়। পাড়া-প্রতিবেশী সমাজ শিউলি ও তার মাকে নিষ্ঠুর বাক্যবাণে বিদ্ধ করে, আর সেই প্রতারক ছেলেটির সঙ্গে জড়িত দুষ্চক্রের লোকেরা হিংস্র প্রতিশোধস্পৃহায় ঘুরে বেড়ায় তাদের চারপাশে। এই নিদারুণ পরিস্থিতির যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে আত্মহত্যা করেন শিউলির মা, অনাথ ও আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে শিউলি। শিউলির জীবনের এই করুণ পরিস্থিতিতে তার পাশে দাঁড়াতে গিয়ে পরিবার ও সমাজের কাছ থেকে প্রচণ্ড বিরোধিতার সম্মুখীন হয় সাংবাদিকতা পেশায় যুক্ত থাকা স্বাধীনচেতা নারী দেয়া।

“পুরুষতন্ত্রের ক্ষমতার একটা সামাজিক মাত্রা আছে, সেটা যুগে যুগে ভিন্নতা পায়।”<sup>৫</sup>

পরিবার ও সমাজ কাঠামোর ক্ষমতার এই বিন্যাসের মধ্য দিয়ে পুরুষতন্ত্র সব যুগে নারীকে বেঁধে রাখতে চায় নিয়মের শৃঙ্খলে। ক্ষমতার এই বিন্যাস, নারীর প্রতি যুগে যুগে ঘটে চলা অন্যায় ও বৈষম্যের দিকটি কাহিনির মধ্যে চিহ্নিত করে দেন দায়িত্বশীল শিল্পীরা।

আলোর গণধর্ষণের ঘটনার তদন্তে আসা পুলিশ অফিসার রক্তাক্ত মৃতপ্রায় আলোর সামনে উপস্থিত হয়ে সেটি রেপ কেস না উভয়ের সম্মতিতে ঘটা কনজুগাল সেক্স তা ঠিক করতে পারেন না। তাঁর মতে ধর্ষকদের চেয়ে অধিক অপরাধী বৃষ্টির রাতে ভিজে অবস্থায় একলা বাসস্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটি। সেই অভিযোগের প্রতিক্রিয়ায় আলোর বন্ধু পাখি উন্মত্ত চিংকারে ফেটে পড়ে। বাস-ট্রাম-ট্যাক্সি-বাড়ি-অফিস-রাস্তাঘাট যে-কোনো জায়গায় আত্মীয়-দারোয়ান-লিফটম্যান-প্রতিবেশী-শিক্ষক-বসের দ্বারা নির্যাতিত যে-কোনো বয়সের মেয়েদের আতর্নাদকে পাখির সেই উন্মত্ত চিংকারে ভাষারূপ দেন লেখক।

“রেপ করার সমস্ত অধিকার আপনাদের আছে? আঁ? যখন খুশি আপনারা উত্তেজিত হতে পারেন! কী বলে আপনাদের আইন? কোথায় আমাদের এক্সিসট্যান্স? না আইন বলে—ডোন্ট এক্সিস্ট? তবে কন্যাক্রমহত্যা লিগ্যাল করে দেয় না কেন আপনাদের আইন? মেয়েরা না থাকলে রেপ কেসও থাকবে না!”<sup>৬</sup>

এক স্বাধীনচেতা প্রতিবাদী নারীকে নরখাদকদের অত্যাচারে মৃত্যুশয্যায় শায়িত দেখে সমগ্র নারী জাতির অস্তিত্বরক্ষায় সোচ্চার হয়ে ওঠে আর এক দৃঢ়চেতা নারীর কণ্ঠস্বর।

ক্রমহত্যা বা গণধর্ষণ ছাড়াও বর্তমান সমাজে দৈনন্দিন জীবনে পড়াশোনা বা চাকরির প্রয়োজনে বাইরে বের হওয়া মেয়েদের কীভাবে হেনস্থা হতে হয়, তার টুকরো ছবি উপন্যাসগুলিতে ছড়িয়ে আছে। অফিস যাবার পথে রাস্তায়-বাসে অযাচিত আপত্তিকর স্পর্শে বিবমিষা উদ্বেক হয় ‘আজও কন্যা’ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র অজন্তার মনে। তার প্রেমিক বন্ধুর ফ্ল্যাটে তার সঙ্গে নিয়মিত ঘনিষ্ঠ হলেও বাড়িতে বিয়ের কথা বলতে অস্বস্তি বোধ করে অজন্তার বাড়ির আর্থিক সঙ্গতি যথাযথ নয় বলে। অজন্তার সহপাঠী বন্ধু শিবেন্দুর বাবার মৃত্যুর পর জানা যায় তাঁর অবৈধ সম্পর্কের কথা। স্বামীর মৃত্যু-সংবাদের চেয়েও প্রাণঘাতী সেই বিশ্বাসভঙ্গের আঘাতে উন্মাদপ্রায় হয়ে যান শিবেন্দুর মা। ‘উড়ো মেঘ’ উপন্যাসে শিউলি গণিকাপল্লি থেকে ফিরে আসা মেয়ে বলে দেয়ার ভদ্র-শিক্ষিত সুচাকুরে স্বামী সৌম্য তার হাতে খাবার খেতে ঘৃণাবোধ করে। এইভাবে সমাজের শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে যে-কোনো শ্রেণির মানসিক পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোয় মেয়েদের জন্য ছকে রাখা বিশেষ মাত্রাটি চিহ্নিত হয়ে যায়।

বিবাহ ও সন্তানধারণের মধ্যেই নারীজন্মের সার্থকতা –এই মধ্যযুগীয় ধারণা যে সমসাময়িক সময়েও একইরকমভাবে বহমান, তার নির্দশন কাহিনিগুলিতে মেলে। এখনও বহু পরিবারে পড়াশোনা বা চাকরির সুযোগে মেয়েরা ছেলেদের থেকে অনেক পিছিয়ে। মেয়ে বড়ো হলে তাকে বিয়ে দিয়ে নিশ্চিত হতে চান মা-বাবা, যদিও সে নিশ্চিন্তি বারংবার সোনার পাথরবাটির মতোই অলীক বলে প্রতীয়মান হয়। অজন্তার মাসি মেয়েকে উচ্চপদের চাকুরে পাঠে সমর্পণ করতে

পেরে পুলকিত হন। অজন্তার স্বাবলম্বী জীবনের চেয়ে তাঁর কাছে স্বামীর রোজগারে মেয়ের অলস জীবন কাটানোর সুযোগ বেশি সৌভাগ্যের, যদিও পরে জানা যায় সে জামাই অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত। তবে উল্টোদিকে কর্মক্ষম মেয়ের রোজগারটুকু হাতছাড়া না করার বাসনায় স্বার্থপরভাবে তার বিয়েতে অনিচ্ছুক মাকেও দেখা যায় এই উপন্যাসে। সংসারের দায়িত্ব বহন করা অজন্তার বিয়ের প্রসঙ্গে উদাসীনতা অনুভূত হয় অজন্তার মা অচলার মধ্যে। বিয়ে হয়ে সে নিজের সংসারে মগ্ন হয়ে গেলে তাদের জীবনে আর্থিক সমস্যা তৈরি হতে পারে ভেবে সবাই অজন্তার বিয়ের কথা বললেও অচলা সে ব্যাপারে নীরব থাকেন, আর মায়ের সেই নীরবতা দুঃখ দেয় অজন্তাকে। দুটি ক্ষেত্রেই মেয়েটির নিজের ইচ্ছেকে তেমনভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। বিবাহকে কেন্দ্র করে মেয়েদের জীবনের বড়ো সমস্যাকে এইভাবে আখ্যানের মধ্যে তুলে ধরেন লেখকরা।

“যেহেতু লিপ্তবৈষম্য পরিবারেই বর্তমান, তাই তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হলে নারীকে অনেক সময় নিজের পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে নীরব ও সরব যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হয়।”<sup>৭</sup>

“মৌনতা-মাতৃত্ব-গৃহিণীপনায় সাফল্যের ওপর গড়ে ওঠে নারীত্বের সংজ্ঞা। আঁতুড় থেকে চিতা পর্যন্ত, এই বোধ নিপুণভাবে আত্মস্থ করতে করতে, নির্ধারিত ভূমিকায় অভ্যস্ত হতে হতে সে সমাজের মনোমত ‘নারী’ হয়ে ওঠে।”<sup>৮</sup>

এই নারীত্বের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ নারীরা অন্যান্য নারীকে সমাজের আদর্শ নারীত্বের মাপকাঠিতে যাচাই করতে বেশি উদ্যোগী হয়ে ওঠে। তাই দেখা যায়, কোনো মেয়ে যখন অত্যাচারিত হয়, বা কোনো মেয়ে যখন সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হয়, তখন ঘরে-বাইরে মেয়েরাই প্রবলভাবে তার বিরোধিতা করে। তাই জীবনের একটা ভুলে শিউলি পতিতাপল্লিতে বিক্রি হয়ে গেলে, সেখান থেকে ফিরে আসার পরেও তার সমাজ তাকে মান্যতা দেয় না। তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গির অনুদারতার দিকেও ইঙ্গিত করেন লেখক। শিউলিকে নিয়ে প্রতিবেদন লেখা সাংবাদিক দেয়া শিউলির মায়ের আত্মহত্যার খবরে বিবেকের তাড়নায় তাকে নিজের ফ্ল্যাটে নিয়ে এলে তার মা, সহকর্মী বান্ধবী, কাজের মেয়ে কারোর কাছেই তার এই কাজ সমর্থন পায়না। তার একান্ত প্রিয় পুরুষটিও দূরে সরে যায় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে।

দেয়ার বৌদি শ্রাবণীর গবেষণা করার ইচ্ছেতে অসন্তোষ প্রকাশ করেন দেয়ার মা। কীভাবে আজও সমাজে পরিবারে একটি মেয়ে আর একটি মেয়ের উন্নতির বিরুদ্ধাচরণ করে থাকে, তাই দেখান লেখক এখানে। দেয়ার শিল্পী বন্ধু ঋতম তার আধুনিক দিদির মুখে অতি পরিচিত ‘বাপের বাড়ি’, ‘শ্বশুরবাড়ি’ শব্দগুলির ব্যবহার শুনে ভাবতে থাকে, মেয়েদের নিজের বাড়ি তবে কোনটা!

“পিতৃতন্ত্রটা যে কীভাবে মজ্জার ভিতর ঢুকে আছে, সেটা মেয়েরাই বুঝতে পারে না।”<sup>৯</sup>

একইভাবে সংসার প্রতিপালনের দায়িত্ব নেওয়া অজন্তাকে তার আত্মীয়দের কাছে শুনতে হয় সে ‘ছেলের কাজ’ করছে। মায়ের চিকিৎসার প্রয়োজনে বিশাল অঙ্কের অর্থ অতি কষ্টে জোগাড় করার পর মায়ের আলমারিতে সে প্রভূত পরিমাণ গোপনে সঞ্চিত অর্থের সন্ধান পায়, যার প্রতিটির নমিনি তার ভাই। বুকফাটা হতশায় সে অনুভব করে, সংসারের সমস্ত দায়ভার মেয়ের উপর দিয়ে চাললেও তার মায়ের সম্পূর্ণ পক্ষপাতিত্ব ছেলে সন্তানের উপর। এইভাবে যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে, এই নিরন্তর বৈষম্যের হেতু অনুসন্ধান করতে চায় অজন্তা। বুকের অন্তরালে জমা অগুণতি প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে থাকে। হয়তো উত্তর খোঁজেন নারী সাহিত্যিক নিজেও, -

“ভাই বিয়ে করলেই গোটা সংসার দুম করে ভাইয়ের কেন হয়ে যায় মা? এ সংসার তোমার নয়? আমার নয়?”<sup>১০</sup>

সময়ের ধারাবাহিকতায় কর্মরত স্বাবলম্বী মেয়ের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু স্বনির্ভর মেয়েদের স্বাধীনতার মতো স্পর্শকাতর জায়গাটিকে দু-একটি ঘটনায় তুলে ধরেছেন লেখকেরা। মেয়েরা উপার্জনে হোক বা মনুষ্যত্ববোধের প্রকাশে কোনোভাবে সঙ্গী পুরুষের থেকে এগিয়ে গেলে স্বামী বা প্রেমিকের মধ্যে পৌরুষের ইগো দানা বাঁধে। পাখির স্বামী প্রদীপ বা দেয়ার স্বামী সৌম্যর আচরণে তার প্রমাণ মেলে। নিজের অক্ষমতায় পাখির টাকায় জীবনধারণে গ্লানি অনুভব করে

তাকে মিথ্যে সন্দেহ করেছে প্রদীপ, সেই জ্বালায় নিজেও জর্জরিত হয়েছে। শিউলিকে সৌম্যর ঘোরতর অপছন্দ হওয়া সত্ত্বেও দেয়া তাকে তাড়িয়ে দিতে রাজি না হওয়ায় গর্জে ওঠে পুরুষের চিরাচরিত অহংবোধ, -

“রোজগার করো বলে খুব তোমার তেল বেড়েছে, অ্যাঁ? আমার কথা শুনে থাকতে পারো তো থাকবে, নইলে ঘাড় ধরে বার করে দেব।”<sup>১১</sup>

স্বাবলম্বী স্বামী-স্ত্রী উভয়ের যত্নে ও প্রচেষ্টায় সুখী গৃহকোণ গড়ে তুললেও হিসেবের সময় তা স্বামীর একক অধিকারের হয়ে যায়। এইভাবে অজস্র টুকরো নিদর্শনের মাধ্যমে একুশ শতকে নারীর অসহায়তা ও বিপন্নতার কথা উপন্যাসগুলিতে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখকরা। সেই বিপন্নতা বর্ণনার ভাষায় অনেক সাদৃশ্য অনুভূত হয়। বোঝা যায়, একুশ শতকের শিল্পী নারীর অনুভবে ও কলমে নারীর বৈষম্য ও অবিচারের যন্ত্রণাগুলি অনেকসময় একই মাত্রায় ধরা পড়েছে।

তবে শুধু বিপন্নতায় মুষড়ে পড়া নয়, একুশ শতকের মেয়েরা কীভাবে সেই বিপন্নতাকে অগ্রাহ্য করে রুখে দাঁড়াচ্ছে, প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠছে তা দেখিয়েছেন ঔপন্যাসিকেরা তাঁদের রচনায়। তিনটি উপন্যাসের মধ্যে এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যটি চোখে পড়ে। পূর্ববর্তী অনেক কাহিনিতে বিদ্রোহী নারীদের যে ছবি পাওয়া গিয়েছিল, তাদেরই পথ ধরে যেন নারীর অপরাডেয় মনোভাবকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন শিল্পীরা। অনুভবে আর উপলব্ধিতে তারা এক, বিভেদ শুধু স্থান আর কালে। অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে আজও তারা অবিচল। কেবল অবিচার ও বিদ্রোহ - উভয়ের ধরণে এসেছে বদল। এই বদলকে যথাযথভাবে তুলে ধরাই সমসাময়িক শিল্পীদের উপযুক্ত কাজ। তাই অজস্তা, পাখি, আলো, স্নিগ্ধা, স্নিগ্ধার শাশুড়ি, দেয়া, শ্রাবণী - এদের সকলের মধ্যে অপার প্রতিকূলতার মধ্যেও সংগ্রামে অটুট মনোবলকে প্রত্যক্ষ করা যায়।

জীবন সম্পর্কে অজস্তার দৃঢ় অপরাডেয় প্রত্যয়, আলোর ভয়াবহ অসহায় অবস্থায় পাখির নির্ভীকভাবে পাশে থাকা, পুলিশ অফিসারের কটু মন্তব্যের কড়া প্রতিবাদ চরিত্রগুলির অনমনীয়তাকে চিহ্নিত করে। স্নিগ্ধা রক্ষণশীল পরিবারের পুত্রবধূ হয়েও তাদের অন্যায়ের বিরোধিতা করে গর্ভের কন্যাসন্তানকে পৃথিবীর আলো দেখিয়েছে। স্নিগ্ধার শাশুড়ি তাঁর অবচেতনের প্রতিবাদকে তুলে ধরেছেন পুরো প্রক্রিয়াটিতে নিজের অজান্তেই নন্দিনী হয়ে স্নিগ্ধার সহায়তা করে, নিজের হাতে তিনি শাস্তি দিয়েছেন স্বামী ও পুত্রকে। দেয়া শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে জয়ী করেছে সৌম্যর সঙ্গে না থাকার সিদ্ধান্ত নিয়ে। সে বলতে পেরেছে, -

“আমিই যাব সেটা ধরে নিচ্ছ কী করে? ... তুমি চলে যেতে পারো। সব সময়ে মেয়েদেরই ঘর ছাড়তে হবে, তার তো কোনও মানে নেই। এ সংসার তুমি একা গড়োনি। এটা যতটা তোমার বাড়ি ততটাই আমার।”<sup>১২</sup>

তবে সর্বাপেক্ষা বড়ো প্রতিবাদ আমরা লক্ষ করি আলোর চারিত্রিক ঋজুতায়। পণের বিপক্ষে গিয়ে সে থানায় রিপোর্ট করলে শাস্তি হয় তার প্রাক্তন প্রেমিকের। ছাড়া পেয়ে সঙ্গীদের নিয়ে একা অসহায় আলোকে অত্যাচারে ছিন্নভিন্ন করে খুন করে ফেলতে চায় তার আহত পৌরুষ। সেই পরিস্থিতিতেও চূড়ান্ত আহত অবস্থায় অপার জীবনীশক্তির পরিচয় দেয় সাহসী মেয়েটি। তরুণী সাংবাদিক দেহের সবটুকু শক্তি নিংড়ে হাতে তুলে নেয় তাকে খুন করার জন্য নিয়ে আসা অজয়ের শাপিত অস্ত্র, আর তার আঘাতে কেটে ফেলে তার পৌরুষের অহংকার, তার পুরুষাঙ্গ। দৃঢ়চেতা আধুনিক নারীর সংগ্রামী মনোভাব ধ্বনিত হয় তার চেতনায়, -

“বুকের পাঁজড়ে যম-যন্ত্রণা! কাঁধ অসাড়। তবে সে দাঁতে দাঁত পিষল। এত সহজে হার মানব কেন? আমি নারী। পুরুষের চেয়ে আমার জীবনীশক্তি সহশক্তি অনেক বেশি। স্নিগ্ধাই তার জ্বলন্ত উদাহরণ। আমি নিজেও অনেক রিপোর্ট কভার করতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছি। পুলিশের লাঠি সহ্য করেছি। কিন্তু হার মানিনি। তবে আজ হার মানব কেন?”<sup>১৩</sup>

এই প্রাণশক্তির বলেই সে বেঁচে উঠেছে, আর পাখি ও স্নিগ্ধার সঙ্গে নন্দিনীর কাছে কুৎফুর ট্রেনিং নেওয়া শুরু করেছে। প্রদীপের মধ্যে দিয়ে লেখিকা নারীর সেই লড়াই শেখাকে স্বাগত জানিয়েছেন, -

“আজ তিন নারীকে শেখাচ্ছে, কাল হয়তো তিন কোটি নারীকে লড়তে শেখাবে! আফটার অল - নন্দিনীরা তো লড়তেই শেখায়, তাই না?”<sup>১৪</sup>

আর একটি বিষয় মনে আশাবাদের সঞ্চর করে, তা হল এই লড়াইয়ে অনেক ক্ষেত্রেই মেয়েরা পাশে পেয়েছে সহৃদয় পুরুষকে, যাদের জন্য তাদের লড়াই অনেকখানি সহজ হয়ে উঠেছে। যেমন পাখির স্বামী প্রদীপ, অজন্তার বন্ধু শিবেন্দু, দেয়ার বন্ধু ঋতম- এদের সকলের মধ্য দিয়ে সাহিত্যিকেরা হয়তো একথা বোঝাতে চেয়েছেন যে, একুশের এই দীপ্তিময়ীরা আর একা নয়। তাদের পাশে আছে একুশের শুভবোধসম্পন্ন তরুণ প্রজন্ম। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে বেড়ে ওঠা সত্ত্বেও যে পুরুষরা মেয়েদের সম্পূর্ণ মানুষের মর্যাদা দেয়, তাদের অধিকার অর্জনের লড়াইকে আরও সহজ করে তোলে। বিশ শতকে ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’ উপন্যাসে সত্যবতীর জীবনের ধ্রুবতারা হওয়া সত্ত্বেও, মেয়েদের প্রতি রামকালী কবিরাজের ভাবনার সীমাবদ্ধতা দেখিয়েছিলেন রচয়িতা, অন্যদিকে একুশ শতকের উপন্যাসে অধ্যাপক স্ত্রীর সাহিত্যিক স্বামী ঋতমের ভাবনায় মেয়েদের প্রতি নিরপেক্ষ শ্রদ্ধাবোধের প্রকাশ দেখালেন সুচিত্রা ভট্টাচার্য। তিলোত্তমা মজুমদারের সৃষ্ট পুরুষ চরিত্র শিবেন্দু প্রিয় নারীর অতীত জীবনের সবকিছুকে অতি সহজভাবে স্বীকৃতি দেয়, -

“একটা সুস্থ স্বাধীন মেয়ে, ভালবেসে স্বেচ্ছায় নিজের প্রেমিকের সঙ্গে মিলিত হয়েছে - এর মধ্যে বাজে কী?”<sup>১৫</sup>

উনিশ বা বিশ শতকে এমন পুরুষ চরিত্র বিরল না হলেও কোথাও যেন মনে হয় একুশ শতকে তাদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। আর তাই তিনটি উপন্যাসেই এমন সহৃদয় পুরুষ চরিত্র অঙ্কিত হয় নারী সাহিত্যিকের কলমে। আর তাদের হাত ধরেই সমস্ত প্রতিকূলতাকে জয় করতে এগিয়ে যায় বিদ্রোহিনীরা। নারী-পুরুষ যৌথ জীবনে, উভয়ের সহায়তায় বৈষম্যহীন এক সমাজ গঠনে হয় প্রয়াসী। লিঙ্গবৈষম্য বিরোধী স্বরকে সৃষ্ট কাহিনিগুলিতে এইভাবে প্রতিষ্ঠা দেন লেখকরা।

## Reference:

১. সেনগুপ্ত, মল্লিকা, *স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ*, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৪, কলকাতা, পৃ. ১৩
২. চট্টোপাধ্যায়, শুক্লা ও সঞ্জমিত্রা দাশগুপ্ত, *নারীবাদ*, প্রথেষ্ট পাবলিশার্স, ২০২৩, কলকাতা, পৃ. ১২১
৩. ভট্টাচার্য, সুকুমারী, *প্রাচীন ভারত সমাজ ও সাহিত্য*, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৪২৯, কলকাতা, পৃ. ৩৯
৪. সেনগুপ্ত, মল্লিকা, *প্রাণ্ডু*, পৃ. ৫৬
৫. ভট্টাচার্য, সূতপা, *মেয়েদের লেখালেখি*, পুস্তক বিপণি, ২০০৪, কলকাতা, পৃ. ২৭
৬. পূততুভ, সায়ন্তনী, *নন্দিনী*, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৩, কলকাতা, পৃ. ১৮৫
৭. চট্টোপাধ্যায়, শুক্লা ও সঞ্জমিত্রা দাশগুপ্ত, *প্রাণ্ডু*, পৃ. ১২১
৮. সেনগুপ্ত, মল্লিকা, *প্রাণ্ডু*, পৃ. ১
৯. ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, *উড়ো মেঘ*, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৯, কলকাতা, পৃ. ২০৪
১০. মজুমদার, তিলোত্তমা, *আজও কন্যা*, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১০, কলকাতা, পৃ. ১৮৯
১১. ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, *প্রাণ্ডু*, পৃ. ২৬০
১২. তদেব, পৃ. ২৬৩
১৩. পূততুভ, সায়ন্তনী, *প্রাণ্ডু*, পৃ. ১৮১
১৪. তদেব, পৃ. ২১০
১৫. মজুমদার, তিলোত্তমা, ২০১০, *আজও কন্যা*, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ১৯